গুরু সান্নিধ্যে

(উৎসর্গ ঃ পরম পূজনীয়া মা-কে

পূর্ব প্রকাশিতের পর

২/৯/৮৪

— অলকেশ লাহিড়ী

ভয়াবহ দিন ও শ্রী শ্রী ঠাকুরের নির্দেশবাণী

বাবা - সামনে যে ভয়াবহ দিন আসছে সে কথা ভেবে আমি বিশেষ চিন্তিত। হয়তো তোমরা খেতে বসেছ, এমন সময় ক'জন মানুষ বাড়ীতে ঢুকে ভাতের থালাগুলি কেড়ে নিয়ে চলে গেল। কাউকে বলার কিছু নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে হবে। তবে ঝড়-ঝাপটা যতই আসুক, কোনো অবস্থাতে তাঁকে কিন্তু ছেড়ো না। দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে গুরুকে আঁকড়ে ধরে থেকো। কেউ তোমাদের একটা চুলও টেড়া করতে পারবে না। অহেতুক কোনো ঝামেলায় জড়াবে না। কারো সাথে কোনরকম বাগ্ বিতন্ডার-ও প্রয়োজন নেই। সব সময় নিজের কাজ এবং গুরুকে স্মরণ-মনন নিয়ে থাকবে। যুক্তি বিবেক সহকারে কাজ করলে ভুল হতে পারে না।

ঘরে নারায়ন, মধু, রেণু, তাপসী, আরতি, শিখা প্রভৃতি বসে আছে। এই মাত্র নিতাই ও অলক ঘরে ঢুকে বসল। এখন সন্ধ্যা আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট। বাবা চুপচাপ শুয়ে সামান্য কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার পর উঠে বসে আবার কথা বলতে শুরু করলেন।

গুরুর কার্য্য ও শিষ্যের কর্তব্য

বাবা - গুরু কি রকম জান? গুরু হচ্ছেন 'ঘটক'। ভক্তের সাথে ভগবানের যোগসূত্র স্থাপন করে মিলন ঘটিয়ে দেন। তোমরা গুরুকে কোথায় স্থান দাও জানি না। আমি কিন্তু আমার গুরুকে সব সময় মাথার উপরেই রাখি (নিজের মাথার উপর হাত রেখে সবাইকে দেখিয়ে)। গুরু কিন্তু শিষ্যকে শুধুমাত্র ভগবানের সাথে মিলন

ঘটিয়ে দেবার চেষ্টাই করেন না, সংসারের খুঁটি-নাটি সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের আপদ বিপদ থেকেও শিষ্যকে রক্ষা করে চলেন। সদা জাগ্রত প্রহরী হয়ে তিনি শিষ্যের সাথে সাথে অবস্থান করেন। যে বিপদ 'তাল' হয়ে শিষ্যের মাথায় পড়ার কথা, তা তিনি 'তিল' পরিমাণ করে দেন। তোমার যদি তাঁর প্রতি দৃষ্টিই না থাকে, তবে তুমি কেমন করে বুঝবে? তাঁর মতো দয়াল, তাঁর মতো আপনজন এ জগৎ সংসারে আর কেউ থাকতে পারে না। এ হেন গুরুর সুবিধা অসুবিধার প্রতি শিষ্যেরও সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। মনুষ্য দেহ ধারণ করেই তিনি জগৎ সংসারে সবার মাঝে এসেছেন। জীবন ধারণের জন্য তাঁরও অন্ন বস্ত্রের প্রয়োজন। সবার মতো তাঁরও যেন দু-মুঠো অন্ন জোটে, শিষ্যের তা দেখা উচিৎ। যদিও তিনি শিষ্যের কাছ থেকে ভক্তি ভালবাসা - এই সব ব্যতীত অন্য কিছুর কোনো প্রত্যাশা করেন না, তবুও এই দিকে দৃষ্টি রাখা শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য।

প্রায় মিনিট দুয়েক চুপ করে থাকার পর বাবা এখন আপনমনে মৃদু হাসছেন। সবাই একদৃষ্টে বাবার দিকে চেয়ে আছে।

সদ্‌গুরু বনাম শয়ন গুরু

বাবা - আজকাল আর সদ্‌গুরুর দেওয়া মন্ত্রে শিষ্যের তেমন কাজ হয় না। মন্ত্রের শক্তি কমে গেছে। (বাবার কথা শুনে সবাই বিস্মিত)। হ্যাঁ (সবার প্রতি), আমার দেওয়া মন্ত্রে তেমন কাজ হয় না। আমি শিষ্যের কানে মন্ত্র দিয়ে বলি, - মন্ত্রটা ঠিকমতো জপ কোরো, গুরুজনদের ভক্তি শ্রদ্ধা কোরো ..... ইত্যাদি। সবকিছু বুঝিয়ে বলা সত্বেও কোনো কাজ হয় না। ঠিক যেমন করতে বলি, তার উল্টোটা করে। ফলে মন্ত্রের কোনো সুফল দেখা যায় না। আর 'শয়নগুরু' শিষ্যের কানে মন্ত্র দিয়ে যেমনটি করতে বলে, শিষ্যও ঠিক তেমনি আচরণ করে। ফলে হাতে নাতে মন্ত্রের ফল পাওয়া যায়। তাহলে বোঝ, শয়নগুরুর দেওয়া মন্ত্রের শক্তি কত বেশী।

অলক (বিস্মিত হয়ে) - বাবা, শয়নগুরু কি?

বাবা (ধমকের সুরে) - আরে আগে শোন, ঠিক বুঝতে পারবে 'শয়নগুরু' কি।

শয়নগুরু কিন্তু বসা অবস্থায় শিষ্যের কানে মন্ত্র দেয় না। শিষ্য শয়নগুরুর কাছ

থেকে মন্ত্রলাভের আশায় অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে থাকে। শয়নগুরু সেটা বুঝে প্রকৃষ্ট শিষ্যের কানে মন্ত্রটি দিয়ে দেয়। ব্যাস.....সঙ্গে সঙ্গে কাজ শুরু। (সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বাবার কথা শুনছে। অপূর্ব এক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ঘরের মধ্যে। একটা সূঁচ পড়লেও বোধহয় আওয়াজ শোনা যাবে। অদ্ভুত এক নীরবতা বিরাজ করছে)।

একই বিছানায় শুয়ে পাশাপাশি বালিশে মাথা রেখে শয়নগুরু গভীর রাতে শিষ্যের কানে মন্ত্র দেয়। মন্ত্র দিয়েই ঠিক যেমন করতে বলে দেয়, শিষ্যও ঠিক তেমনই করে। ফলে হাতে নাতে মন্ত্রের ফল পাওয়া যায়। সকাল হতেই দেখা যায় - হাঁড়ি আলাদা....., বাড়ী আলাদা....., জন্মদাতা বাপ-মা পর, ভাই বোন পর, সব আলাদা..... সব পর।' তাহলে দেখ, শয়নগুরু দেওয়া মন্ত্রের শক্তি কত বেশী।

শয়নগুরুর রহস্যটি এতক্ষণে সবার বোধগম্য হলো। মুর্হুত্ত মধ্যে ঘরের নিস্তব্ধ পরিবেশ একেবারে ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেল। প্রচন্ড হাসির রোল উঠেছে ঘরের মধ্যে। সবার মুখে মুখে 'শয়নগুরু' নামটি উচ্চারিত হচ্ছে। হাসির আওয়াজ শুনে মা একবার ঘরে এসে ঢুকলেন। ব্যাপারটি বুঝে নিয়ে আবার চলে গেলেন। ঘরে সবাই হাসছে। বাবাও প্রচন্ড হাসছেন এবং বসা অবস্থায় দুলে দুলে দু-হাত তুলে বিচিত্র ভঙ্গীতে বলে চলেছেন, - "হাঁড়ি আলাদা..... বাড়ী আলাদা..... বাপ মা পর ..... ভাইবোন পর.....।" এ ধারে শিষ্য বলে চলেছে, -"ও..... যত দোষ নন্দ ঘোষ, সব দোষ আমাদের।" বাবার কিন্তু সে কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। একই ভঙ্গীতে তিনি বলে চলেছেন, "হাঁড়ি আলাদা .....বাড়ী আলাদা.....ইত্যাদি।" কিছুক্ষণ পরে তিনি একদম গম্ভীর হয়ে গেলেন। সবার হাসি এখন থেমে গেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে মুখ টিপে অনেকেই হাসছে। বাবা এবার গম্ভীর স্বরে ধীরে ধীরে বলছেন ঃ-

ঘরে বাইরে সর্বত্র তো এই একই চিত্র দেখছি! তাই খুব একটা মায়া-মোহ বা প্রলোভনে জড়াবে না। ওটা নিজেকে ডোবাবার একটা রাস্তা, He অথবা She যাই হওনা কেন।

শয়নগুরু সম্বন্ধীয় কথাগুলি শুনে মাতৃ জাতির কেউ যেন শ্রী শ্রী ঠাকুর সম্পর্কে অহেতুক বিরূপ মনোভাব পোষণ না করেন। মাতৃজাতির প্রতি তিনি যে কতটা শ্রদ্ধাশীল, তাঁর সামান্য সংস্পর্শে এলেই তা বোঝা যায়। শয়নগুরু-র দৃষ্টান্তটি স্ত্রী বা পুরুষ যে কোনো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শ্রী শ্রী ঠাকুর মুখনিঃসৃত কথাগুলির শেষ লাইন হতে তা পরিস্কার বোঝা যায়।

হু-যুগ শেষে সত্যযুগ

বাবা সমেত সবাই বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর নারায়ণ বাবাকে জিজ্ঞাসা করছে, বাবা, কলিযুগের এই রকম ডামাডোল অবস্থা আর কতদিন চলবে?

বাবা - আর বেশীদিন নয়। ২০০০ সালের পর শেষ হয়ে যাবে। তারপর সত্যযুগ। আমি বলি, এই যে কলিযুগ, এটা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন যে যুগ চলছে তা হলো কলিযুগের-ই একটা ল্যাজা। যেমন টিকটিকির ল্যাজ খসে গেলে তিড়িং বিড়িং করে কেমন লাফায় দেখনা? সেইরকম, এটা কলিযুগের-ই একটা ল্যাজ 'হু-যুগ' (হু জুক)। তিড়িং বিড়িং করে কিছুক্ষণ লাফিয়ে নিস্তেজ হয়ে যাবে। তোমরা পরীক্ষা করে দেখ। ক'জন বন্ধু মিলে তোমরা একই ডিজাইনের কয়েকটা জামা বানাও। সামনের দিকটায় হলুদ রং এবং পেছনে লাল রং। তাতে বিভিন্ন রং এর কয়েকটা মোটা মোটা ক্রশ চিহ্ন এবং চক্‌রা-বক্‌রা চিহ্ন দাও। তারপর ঐ জামা পড়ে কয়েকদিন তোমরা ঘুরে বেড়াও। দেখবে কিছুদিনের মধ্যে ঐ ডিজাইনের জামা বাজারে চালু হয়ে গেছে। সবার গায়ে ঐ ডিজাইনের জামা দেখতে পাবে। রাস্তা ঝাড়ু দেওয়া প্যান্ট (Bell bottom) দেখনা? যেন দু-খানা সায়া একসাথে জোড়া দিয়ে প্যান্ট বানানো হয়েছে। চলছে আর রাস্তা ঝাড়ু দিচ্ছে। সবাই পড়ে বেড়াচ্ছে। বোঝ তাহলে কেমন যুগ চলছে। অবস্থা চরমে না গেলে পরিবর্তন তেমনভাবে আসে না। তাই এই অবস্থা।

বীজমন্ত্র ও শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ - নাম মাহাত্ম্য

সামনে যে দিন আসছে বহু রথী - মহারথী ধরাশায়ী হবে। তোমাদের চোখের সামনে বহু কিছু ঘটবে। সবকিছু দেখবে শুনবে, কিন্তু কোনো মন্তব্য করবে না বা কাউকে কিছু বলবে না। আমার বাবা (পরম গুরুদেব) আমাকে বলেছিলেন, - "তুই

যদি গুহাতে থাকিস, সংসারী মানুষেরা তোর কাছ থেকে কি পাবে"? তাই আমি বাবার দেওয়া 'বীজ' তোমাদের সবাইকে দিয়ে গেলাম। জলে স্থলে পাথরে আগুনে, যেখানেই এ 'বীজ' পড়ুক, গাছ হবেই। তবে কিছু আগে বা পরে। সময়ের তফাৎ হতে পারে। কিন্তু বাবার দেওয়া 'বীজ' থেকে গাছ জন্মাবেই। তাঁর মতো শক্তিধর মহাপুরুষ, তাঁর মতো দয়াল আজ পর্যন্ত বিশ্বে হয়নি, হবেও না। একবার মাত্র তাঁর 'নাম' উচ্চারণ করার সাথে সাথে অজস্র ঐশ্বর্য্যপূর্ণ দেহ হতে তাঁর আশীর্বাদ সেই উচ্চারণকারীর ওপর বর্ষিত হয়। (কথাটি বহুজনের দ্বারা পরীক্ষিত সত্য। বাবার চোখে জল)। আসলে এই বিশ্বটা তিনিই চালাচ্ছেন।

শিষ্যের শাস্তি বিধান

আমিও কখনও মনে করিনা আমি নিজে কিছু করছি। আমার বাবাই সবকিছু করছেন। সবাইকে তিনিই দেখছেন। কিন্তু আমার ছেলেরা কোনও ভুলচুক করলে আমি নিজেই তার শাস্তি বিধান করি। তখন আমি বাবার ওপর ছেড়ে দেই না। শাস্তি দেওয়ার ভার আমি বাবার ওপর ছেড়ে দিই না কেন জান?

একবার আমি মুঙ্গেরে গেছি। সেখানে আমার এক শিষ্য ছিল। মুঙ্গের শহরে তার বেশ নাম ডাক ছিল । আমি অনেকদিন আগে একবার তার বাড়ীতে গেছিলাম তাই তার বাড়ীটা সঠিকভাবে আমার মনে ছিল না। আমি এদিক সেদিক তার বাড়ীটা খুঁজছি। একটা বড় দোকান দেখে সেখানে গেলাম বাড়ীটা কোথায় জিজ্ঞাসা করার জন্য। পাশাপাশি কয়েকটা দোকান একই মালিকের। কোনোটা টায়ার টিউবের, পাশেরটা মনিহারীর ..... এইসব। দোকানগুলোর ওপর তলায় মালিকের বাড়ী, সেখানে উনি বাস করেন। আমি বাড়ীর ঠিকানাটা জিজ্ঞাসা করব মনে করে সবে দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে সেই মালিক আমার কাছে এসে অকথ্য-কুকথ্য ভাষায় আমাকে গালি গালাজ শুরু করলেন। চোর বদমায়েস ইত্যাদি যা মুখে এল সবই বললেন। এমনকি আমার বাপ-মাকে পর্য্যন্ত গালমন্দ করতে ছাড়লেন না। এসব দেখে রাস্তায় বেশ কিছুলোক জড়ো হয়ে গেল। তারা ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করল। একমাত্র মার খাওয়াই বাকী ছিল আমার। আমি তো একেবারে হতভম্ব হয়ে মনে মনে বাবাকে স্মরণ করে বললাম, - বারে বাবা, তুমিই আমাকে এখানে পাঠালে, আবার তুমিই আমাকে গালমন্দ করলে। এখন তুমিই সবকিছু দেখো. এই বলে আমি ঐ দোকানের সামনে রাস্তার উল্টোদিকে আরেকটা মিঠাই-এর দোকানে গেলাম।

সেখানে যেতেই দোকানদার আমাকে ভেতরে নিয়ে বসালেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, - সামনের ঐ দোকানের মালিক আপনাকে গালমন্দ করছিলেন, তাই না? ওনার স্বভাবটাই ঐরকম বুঝলেন? তারপর সেই শিষ্যের বাড়ীটা জানতে চাওয়ায় উনি চিৎকার করে কাউকে ডাকলেন। সঙ্গে সঙ্গে ১৪/১৫ বছরের একটা ছেলে পাশের কোথাও থেকে এল। ছেলেটাকে উনি সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন। তারপর তাকে সঙ্গে নিয়ে দোকানদার নমস্কার জানিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। দোকান থেকে সামান্য কিছু দূরে সেই শিষ্যের বাড়ীতে ছেলেটা আমাকে পৌঁছে দিল। সেখানে তো এতদিন পরে আমাকে পেয়ে বাড়ীর লোকজন মহাখুশী। সেখানে আমি রাত্রি বাস করলাম। পরদিন সকালে বাড়ীর সামনের বাগানে একটা চেয়ারে বসে আমি খবরের কাগজ দেখছি। এমন সময় সেই ছেলেটা, যে আমাকে গতকাল এখানে পৌঁছে দিয়েছিল, ছুটতে ছুটতে এসে বলল, - জানেন সাধুবাবা, কাল যে লোকটা আপনাকে গালমন্দ করেছিল রাতে সে আগুনে পুড়ে মারা গেছে। রাতে হঠাৎ তার দোকানগুলোতে আগুন লাগে। উনি তখন ওপরে ঘুমিয়ে ছিলেন। সব দোকানগুলো এবং বাড়ী সমেত উনি একদম শেষ। পুলিশ এসেছে। ওখানে এখন লোকে লোকারণ্য। কথাগুলো শুনে আমার মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। আমি তো এরকম চাইনি! তবে কেন এমন হলো? ওখানে বসেই ধ্যানে বাবাকে স্মরণ করে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন বাবা দেখা দিয়ে বললেন, - "পাগল,তোর জন্যই তো এমন হলো। ভদ্রলোক যখন তোকে গালি গালাজ করলেন, তুই-ও কিছু একটা করলে আমাকে আর আসতে হতো না। কিন্তু সে সব না করে তুই সবকিছু আমার ওপর ছেড়ে দিলি। আমিও দেখলাম ভদ্রলোকের এ জন্মের আয়ু শেষ হয়েছে। সেই মতোই ব্যবস্থা হলো। এজন্য এরপরে তাঁর ভালই হবে।" এবার বুঝলে তোমরা, কেন আমি শাস্তি দেওয়ার ভার বাবার ওপর ছেড়ে দিইনা? বাবার ওপর ছেড়ে দিলে তিনি নিক্তিতে ওজন করে কড়ায় গন্ডায় মিলিয়ে দেবেন যা সহ্য করা অধিকাংশের পক্ষে অসম্ভব হবে। সেখানে গুরুতর অপরাধের শাস্তি, সামান্য একটা আঁচড় দিয়েই আমি পার করে দিই।

পরম গুরুদেব শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ

নারায়ণ - বাবা, উৎসব অনুষ্ঠানে আপনি যেখানে যান আপনার গুরুদেব ও সেখানে আসেন তাই না?

বাবা - হ্যাঁ, তবে তাঁকে চেনা সহজ নয়। বিভিন্ন রূপে তিনি আসেন। যখন য ভাষায় কথা বলেন তখন সেই দেশীয় বলে মনে হয়।

একবার এই বাড়ীতে বাসন্তী পূজোর উৎসবে সবার সাথে বসে উনি প্রসাদ নিলেন। কে যেন একজন, তোমাদেরই গুরুভাই তাঁর নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেছিল। জবাবে উনি বলেছিলেন, - তাঁর নাম বিশ্বনাথ এবং Post office -এর কাছে থাকেন। উনি তো প্রসাদ নিয়ে চলে গেলেন। পরে তাঁর আসল পরিচয় জানাজানি হলে সবাই তখন সেই এঁটো পাতা নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করল। আর এক সময় কোনো এক ভক্ত তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি কোথায় থাকেন'? উনি জবাব দিয়েছিলেন - Switzerland -এ। আসলে মহাত্মা দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। মহাপুরুষের কথার অর্থ চিন্তা ভাবনা না করলে সঠিকভাবে বোঝা যায় না। এই যে তিনি বললেন তাঁর নাম 'বিশ্বনাথ'। এর অর্থ হলো উনিই 'বিশ্বের নাথ' (সর্বকর্তা)। আবার Post office বলাতে তুমি ভাবলে চন্দননগর Post office-এর কাছে থাকেন। কিন্তু তা নয়। এ হলো ভবের Post Office, যেখান থেকে সমগ্র বিশ্বের সংবাদ আদান প্রদান হয়। আবার Switzerland -এ থাকেন কথাটা তোমরা ভেঙ্গে দেখ। Sweet-jar-land অর্থাৎ যে পাত্রের মধ্যে মিষ্টি আছে সেখানে থাকেন। যেখানে আনন্দ সেখানেই তিনি। তিনি আনন্দময়। গভীর-ভাবে চিন্তা না করলে মহাপুরুষের কথার সঠিক অর্থ বোঝা মুশকিল। একই কথার বহুরকম অর্থ হতে পারে। যার চিন্তা ভাবনা যেমন, তার কাছে তেমনভাবেই অর্থ প্রকাশ পায়।

বহু সাধকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। এর মধ্যে ভূপেন সান্যাল দেখতে খুব সুন্দর ছিল। দুধে-আলতায় গায়ের রং। চুপচাপ বসে থাকত। সৌম্য চেহারা একেবারে যেন স্বয়ং 'শংকর' (শিব) বসে আছে। কিন্তু বাবার মতো সুন্দর আর আর কাউকে দেখিনি। তপ্ত কাঞ্চনের মতো গায়ের রং। শরীর থেকে মনে হয় অসংখ্য সূর্য্যের ছটা বের হচ্ছে। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না।

(কথাগুলি বলে বাবা একদৃষ্টে দেওয়ালে টাঙ্গানো তাঁর গুরুদেবের ফটোর দিকে চেয়ে আছেন। এমন সময় মা ঘরে এসে ঢুকলেন। বাবা একবার 'জয়গুরু শ্রী গুরু' ধ্বনি তুলে মা-কে বলছেন) ঃ-

<u>মতবিরোধ</u>

হ্যাঁ গো, আজ রাতে কিছু খাব না।

মা - সামান্য একটু কিছু খেও।

- না না কিচ্ছু খাব না।

একেবারে না খেয়ে থাকবে কেন; বল কি খাবে?

না না আমার একদম ক্ষিদে নেই।

একটু দুধ আর একটা রুটী খেও।

না, পেট-টা ভার হয়ে আছে। (বাবা পেটে হাত দিয়ে একটা ঢেকুর তুললেন)।

হ্যাঁ তুমি খাবে। রোজ রাতে খাওয়া নিয়ে তুমি এইরকম করো। আমার এসব একদম ভাল লাগে না।

একটু রেগেই কথাগুলি বলে মা ঘর থেকে চলে গেলেন। বাবা চুপ করে বসে আছেন। দৃষ্টি তাঁর একটু উদাস বলে মনে হচ্ছে। মা-র ইচ্ছা, সামান্য হলেও বাবা যেন রাতে একটু কিছু আহার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু বাবা রাতের বেলায় প্রায়ই উপবাসী থাকতে চান। ফলে উভয়ের মধ্যে এ ব্যাপারে মাঝে মধ্যে মতবিরোধ হতে দেখা যায়। সময় সময় এই মতবিরোধ এত তীব্র হয়, মনে হয় মা বাবার মধ্যে বুঝি বা কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পরক্ষণে সবকিছু আবার স্বাভাবিক দেখা যায়। রাতে বাবার উপবাসী থাকার পেছনে রহস্য কি আছে জানিনা। তবে যোগীশ্বর শ্রী শ্রী কালীপদ গুহ রায়-এর (যিনি কলকাতার বুকে দীর্ঘকাল বাবার সঙ্গলাভ করেছিলেন) জীবনী পাঠ করে আমরা অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ পাই।

".....রাত তখন বারোটা। কোন একটা কারণে তিনি (যোগীশ্বর) বাড়ীর সবার প্রতি খুব রেগে গেলেন। অনেক সাধ্য-সাধনা করেও তাঁকে খাওয়ানো গেল না। আসলে ক্রীয়া অনুষ্ঠানের ব্যাপার থাকলে তিনি ঐভাবে চটাচটি করে একটা আছিলায় উপবাসী রইলেন।" [অমিয় কুমার মজুমদার রচিত 'যোগীশ্বর' গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠা থেকে]

শ্রী গুরুধামে রাতের আহার পর্ব বেশ কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়েছে। সবার শেষে মা রান্নাঘরে বসে নিজের আহার সারলেন। মা-র কথামতো বাবা সামান্য একটু দুধ ও একখানা রুটী খেলেন। কোন আপত্তি না করে বেশ সন্তুষ্ট চিত্তেই তা গ্রহণ করলেন। রান্নাঘরের কাজকর্ম সেরে বাবার অনুমতি নিয়ে এবং অন্যান্য সবাইকে

লে মা শুতে চলে গেলেন। এখন রাত এগারটা বেজে কুড়ি মিনিট। বাবার সামনে নারায়ণ, নিতাই ও অলক বসে আছে। স্থানীয় ভক্ত-শিষ্যগণ আহারপর্ব শুরু হওয়ার আগেই নিজ নিজ বাড়ীর উদ্দেশ্যে বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

গূঢ় ইঙ্গিত

অলক - আগামীকাল আমরা যাব বাবা।

বাবা - দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে যেও। (কয়েক মূহুর্ত পরে বেশ ধীরে ধীরে) কোথায় আর যাবে তোমরা। তোমরা তো ব্যান্ডেল হয়ে ফরাক্কায় যাবে তাই না!

অলক - হ্যাঁ বাবা।

বাবা - সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আমার জাল বিছানো আছে। তোমরা সেই জালের মধ্যেই এদিক সেদিক নড়াচড়া করছ। আবার যখন প্রয়োজন হবে, জাল গুটিয়ে নেবার মতো করে সামান্য একটু টান দিলেই তোমরা এসে পড়বে।

কথাগুলি শুনে সবাই নিবিষ্টমনে এর প্রকৃত ভাবার্থ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। এই সুযোগে বাবা সবাইকে পর্য্যবেক্ষণ করছেন। তিনি বোধহয় দেখে নিতে চাইছেন কথাগুলির প্রকৃত ইঙ্গিত সবাই ধরতে পারছে কিনা।

অলক (স্বগত) - বাবা যেন কথাগুলির মাধ্যমে বোঝাতে চাইছেন, জগতে কেউ তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়। অদৃশ্য জালের মাধ্যমে সবাইকে তিনি ধারণ করে আছেন। তাঁর কর্মকান্ড সমগ্র জগতে বিস্তৃত যা কিনা তাঁর জগৎ ব্যাপী কর্তৃত্বের ইঙ্গিত বহন করে। তাহলে জগৎ ব্যাপী কর্ত্তৃত্বের অধিকারী তো 'জগদগুরু' ছাড়া আর কেউ নন।

মানুষের মধ্যেই ভগবান

বাবা - তিনি মানুষ হয়েই আসেন। কিন্তু কখন কোন রূপে তিনি তোমার কাছে আসবেন তুমি জাননা। হয়তো ল্যাংড়া কানা ভিখারী সেজে তিনি তোমার কাছে গেলেন, তুমি দূর.... দূর করে তাড়িয়ে দিলে। অর্থাৎ হাতের কাছে পেয়েও তাঁকে ধরতে পারলে না। তাই কোনো মানুষকে উপেক্ষা করা উচিৎ নয়। দরজায় ভিখারী এলে তাকে কিছু না দিতে পারলে অন্ততঃ হাত জোড় করে নম্রভাবে কথাটি বোলো। অযথা উপদেশ দিও না। তিনি কিন্তু বিভিন্ন রূপে তোমাদের কাছে যাচ্ছেন। তোমরা

তে পারছ না। তাই মানুষের সেবা কর, মানুষকে ভালবাস, মানুষের মধ্যেই তাঁকে জ। এই 'মানব-মনস্তত্ত্ব' যে যত বেশী বুঝতে পারে সে তত বেশী ওপরে ওঠে।

একদিন যখন সবাইকে সেই Goal-এ (লক্ষ্যে) পৌঁছাতেই হবে, তবে তা যত হয় ততই মঙ্গল নয় কি?

সবাই (একসাথে) - হ্যাঁ বাবা।

শিষ্যের পরীক্ষা

বাবা - তবে তিনি কিন্তু পরীক্ষা নেন। গুরু শিষ্যের কাছ থেকে চারটি পরীক্ষা ন। ঘর্ষন, তাপন, তাড়ণ, ছেদন - এই চারটি পরীক্ষা। স্বর্ণকার যেমন প্রথমে ষ্টিপাথরে ঘষে ঘষে সোনার খাদ যাচাই করে, গুরুও তেমনি ঘষে ঘষে শিষ্যের দোষ ত্রুটী পরীক্ষা করে। খাদ যাচাই শেষে তাপে সোনা গলিয়ে তাকে খাদশূণ্য রা হ য়। সেইরকম, শিষ্যকেও তাপে গলিয়ে পুড়িয়ে দোষত্রুটী মুক্ত করা হয়। াদশূন্য (পাকা বা খাঁটি) সোনা কি রকম হলো তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে সেটাকে একটা বিশেষ আকৃতিতে আনা হয়। তারপর অলংকার তৈরীর জন্য তা থেকে প্রয়োজনীয় সোনা ছেনি দিয়ে কেটে নেওয়া হয়। শিষ্যও কতটা খাঁটি হলো, গুরু তা পিটিয়ে পিটিয়ে পরীক্ষা করেন। শেষে চরম পরীক্ষা হিসাবে শিষ্যকে 'ছেদন'-এর সম্মুখীন হতে হয়। পরীক্ষা শেষে গুরু শিষ্যকে হাত ধরে তাঁর কাছে পৌঁছে দেন।

সবার কাছ থেকে তিনি কিন্তু এই পরীক্ষা নেন না। কেবল মাত্র ভক্তের কাছ থেকেই তিনি এই পরীক্ষা নেন। নিতাই - সবার কাছ থেকে কেন তিনি পরীক্ষা নেন না? বাবা - সাধারণতঃ ধর্ম্মপথে বিশেষ কেউ আসতে চায় না। তার ওপর তিনি যদি সবার পরীক্ষা নিতে শুরু করেন, সবাই বলবে - ধর্ম্ম আমার মাথায় থাক, এবার আমি চলি।

অলক - এই পরীক্ষা শুরু হয় কিভাবে?

বাবা - সংসারের বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে এই পরীক্ষা। যার যে দিকটা (কাম, ক্রোধ ..... ইত্যাদি) বেশী প্রবল, সেটা দিয়েই এই পরীক্ষা শুরু হয়।

অলক - শিষ্যের সাথে সাথে গুরুকেও তো বিভিন্নভাবে পরীক্ষা দিতে হয়?

বাবা - হ্যাঁ বাবা। আমার বাবা ২৬০০০ ফুট উঁচু পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতে বলে আমার পরীক্ষা নিয়েছিলেন। তাছাড়া গুরু-র পরীক্ষা দেওয়ার শেষ নেই। সমগ্র জীবন ভর তাঁকে পরীক্ষা দিতে যেতে হয়। রাত-বিরাতে কখন কে বিপদে পড়ে তাঁকে স্মরণ নেয়, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বিপদমুক্ত করতে হয়। তাঁর বিশ্রামের বা ঘুমের অবকাশ কোথায়? সবার দরজায় দরজায় আমি ঘুরি। কখনো কখনো কারো মুখটা দেখি বিষন্ন, সঙ্গে সঙ্গে তার সেই বিষণ্ণ ভাবটা কাটিয়ে দিয়ে আসি। আবার কেউ বা রাতে দরজা বন্ধ না করেই ঘুমিয়ে পড়ে। তখন রাত ভর আমাকে তার বাড়ী পাহারা দিতে হয়। সবার জন্য আমি ভেবে মরি। কিন্তু আমার জন্য কজন ভাবে? (আহা, দয়াল ঠাকুর কি প্রেমের কথাই না শোনালেন)!

নিতাই (একটুক্ষণ পরে) - কেউ যদি পরীক্ষায় পাশ না করতে পারে, তখন তিনি তার জন্য ভেবে কষ্ট পান না?

বাবা - ভক্ত তাঁর প্রণ। ভক্তের জন্য তিনি অনেক ফাঁক রেখে দেন। দেখনা অহল্যাকে উদ্ধারের জন্য তিনি 'যুগ' পাল্টে দিলেন? সত্যযুগের পর দ্বাপরের বদলে 'ত্রেতা যুগ' এল।

অলক - তাহলে যদি ধরে নিই ভক্ত কখনো পরীক্ষায় ফেল করে না, তবে তিনি তার পরীক্ষা নেন কেন?

বাবা - বিভিন্নভাবে পোড় না খেলে খাঁটি হয় না। খাঁটি বা শুদ্ধ না হলে ঈশ্বরের ধারণা করা যায় না। তাই এই পরীক্ষা। দেহটা সবদিক থেকেই ঈশ্বর ধারণার উপযুক্ত হওয়া চাই। তোমরা সেই বাউল গানটা শোননি?

"রাখিতে নারি লি প্রেমজল কাঁচা হাঁড়িতে

পাকা হাঁড়ি যদি হবি গুরুর বাড়ী চলে যাবি

প্রেমানলে দগ্ধ হয়ে করবি টলমল

ও কাঁচা হাঁড়িতে রাখিতে নারিলি প্রেমজল।"

মাটির একটা কাঁচা হাঁড়িতে জল ঢাললে হাঁড়ি গলে যায়। কিন্তু হাঁড়িটা আগুনে পুড়িয়ে পাকা করে নিলে, তাতে আর জল রাখতে অসুবিধে হয় না।

নিতাই - তাহলে পরীক্ষার ব্যাপারে কিছু ভেবে লাভ নেই। তিনি যা করার করবেন।

বাবা - হ্যাঁ, ওসব নিয়ে তোমাদের চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। তোমরা তাঁর নির্দেশ অনুসারে কাজ করে যাও। তাঁর সবকিছু ঠিক করাই থাকে। (বাবাকে প্রণাম করে তাঁর অনুমতি নিয়ে নারায়ণ উঠে গেল)

ঈশ্বরকোটি ও অবতার

অলক - আচ্ছা বাবা, যারা ঈশ্বরকোটি তাদের কি ঈশ্বরলাভ আগেই হয়ে গেছে?

বাবা - হ্যাঁ, ঈশ্বরকোটি কোটিতে গুটি, আর এখন কয়েক কোটিতে একটি। (অর্থাৎ বাবা বলতে চাইছেন, পূর্বে প্রতি কোটি মানুষের মধ্যে গুটিকয়েক ঈশ্বরকোটি ছিলেন। আর বর্তমানে কয়েক কোটিতে একটি করে মাত্র)।

অলক - ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণদেবের সাথে ব্রহ্মানন্দ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি ঈশ্বরকোটি ভক্ত ছিলেন। তোমার সাথেও তো তাহলে সেইরকম ঈশ্বরকোটি পর্য্যায়ের ভক্ত আছে?

বাবা - তিনি যখন আসেন একা আসেন না। সাঙ্গ-পাঙ্গ সবাইকে নিয়েই আসেন। শ্রী কৃষ্ণ যখন এসেছিলেন তখন একটা 'কংস' ছিল। আর এখন ঘরে ঘরে কংস। তাদের সবাইকে দমন করা একটা শ্রী কৃষ্ণের কাজ নয়। শত শত শ্রীকৃষ্ণের দরকার। তাই তাঁকেও সেইরকম ভাবেই সেজে গুজে আসতে হয়েছে। না হলে এই বিশ্বকে ভরাডুবির হাত থেকে টেনে উঠিয়ে রক্ষা করা যাবে না।

নিতাই - কিন্তু এখনও কারো মধ্যে সেরকম কিছুর প্রকাশ দেখা যায় না কেন?

বাবা - কলির জীব সব সঙ্কুচিত অবস্থায় আছে। তারা নিজেরাই জানে না - তারা কে। যখন তারা নিজেদের স্বরূপ জানতে পারবে, নিজেরাই অবাক হয়ে যাবে। অবশ্য, বেশ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলে একটু কিছু যে বোঝা না যায় তেমন নয়।

অলক - যারা ঈশ্বরকোটি গুরুদেব তাদের জানিয়ে দেন না কেন?

বাবা - জানিয়ে দিলে তারা সাধন-ভজন কিছু করবে না। তারা এখন জানে না

বলে সাধন-ভজন এক-আধটু করছে। তাদের দেখে আরও পাঁচজন কিছু একটু করছে। এতে লোক শিক্ষা হচ্ছে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তারা শুনে ফেলবে, তারা 'ঈশ্বর কোটি' - তারা ভাববে সাধন-ভজন আর তেমন না করলেও চলবে। নির্দিষ্ট সময়ে তারা সবকিছুই লাভ করবে। সাধন-ভজন সে রকম না করে হাত পা গুটিয়ে বসে যেতে পারে। তাই তিনি আগে থেকে তাদের কিছু জানতে দেন না।

নিতাই - তুমি বা মা, তোমাদের কি পূজো-টুজো করার দরকার আছে?

বাবা - না। কিন্তু এটা লোকশিক্ষার জন্য আমাদের করতে হয়। কথায় আছে - 'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরেরে শিখায়।" আমি নিজেই যদি এসব না করি, তবে অন্য সবাইকে করতে বলব কি করে? শুধু শুধু কথার কথায় কোন কাজ হয় না। আর এখন যে যুগ, তাতে নিজেকে সবকিছু করে দেখাতে হবে আগে। তবেই অন্য সবাই তা গ্রহণ করবে।

অলক - শিষ্যের প্রধান কাজ কি?

বাবা - গুরুর প্রচার।

নিতাই - প্রকৃত মানুষ না হলে কি গুরুর প্রচার করা যায়?

বাবা - তা হয় না। শিষ্যের আচার আচরণের মাধ্যমেই গুরুর প্রকাশ ঘটে থাকে। যে গুরু দাঁড়িয়ে মোতে (প্রস্রাব করে), তার শিষ্যও দৌড়ে দৌড়ে মোতে। প্রকৃত মানুষ হলে তোমার আচার আচরণই বলে দেবে - তোমার গুরু কি রকম। তোমাকে আর বলতে হবে না। তাই আগে মানুষ হও।

নিতাই - আমরা মানুষ হতে পারব তো?

বাবা - তাঁর আশীর্ব্বাদ যখন আছে তখন আর চিন্তা কি? (বাবার মুখটি এক বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। হাসি হাসি মুখে তিনি বলছেন) ঃ-

আমি দেখছি কিছু সংখ্যক 'বীজ' থেকে ইতিমধ্যে 'চারাগাছ' জন্মেছে? তার মধ্যে কিছু চারাগাছ আবার বেশ বড় হয়ে গাছের চেহারা নিয়েছে। গাছের গুঁড়ি গুলোও বেশ মোটা হয়েছে। গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেগুলোকে আর ঘেরা দিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই। উপরন্তু তাতে দু-চারটে গরু ছাগল বেঁধে

রাখলেও গাছের কোন ক্ষতি হবে না।

অলক - তোমার যারা চিহ্নিত সন্তান, তারা কি সবাই তোমার কাছে এসে গেছে?

বাবা - না, সবাই এখনও আসেনি, বাকী আছে। তবে আমার কিন্তু সেরকম কোন 'রসদ-দার' নেই। শ্রী রাম কৃষ্ণের সময় মথুরবাবু, বলরাম বোস প্রভৃতি রসদ-দার ছিল। আমার কাছে সেরকম কেউ নেই।

নিতাই - রসদ-দার থাকে কেন?

বাবা - তিনি এক বিরাট কর্মভার নিয়ে জগতে আসেন। সেটা সুসম্পন্ন করতে অর্থের প্রয়োজন। রসদ-দার না থাকলে তার অর্থের জোগান দেবে কে?

নিতাই - তাহলে তোমার সেরকম রসদ-দার আসবে না?

বাবা - কি জানি বাবা যদি পাঠান আসবে।

নিতাই - 'অবতার' যখন আসেন তখন সবাই জানতে পারে না কেন?

বাবা - সবাই জানতে পারলে তাঁর একটা চুল দাড়িও থাকবে না। হাজারে হাজারে মানুষ তাঁর কাছে ছুটবে। তাঁর বাসস্থান জনসমুদ্রে পরিণত হবে। সেই অবস্থায় কাজ করা তো দুরের কথা। বিশ্রামাহারের জন্যও তিনি ফুরসৎ পাবেন না। তাহলে তাঁর আসার প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে না। কোনো কিছু না করেই তাঁকে চলে যেতে হয়। তাই তিনি যখন আসেন, অত্যন্ত গোপনে আসেন। সাধারণ মানুষ জানতে পারে না। গুটিকয়েক ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ এবং তাঁর কিছু অন্তরঙ্গ ভক্ত ছাড়া বিশেষ কেউ জানতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্র যখন এসেছিলেন, বারোজন ঋষি মাত্র জানতেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকেন এবং নির্দিষ্ট কর্ম করে যান। সবাই তাঁকে তাঁদের মতো একজন সাধারণ মানুষ বলেই ভাবে। কাজটি শেষ হলেই তিনি চলে যান। তারপর তাঁর প্রচার শুরু হয়। তখন সাধারণ মানুষ তাঁর অদর্শনে হাহাকার করে ওঠে।

অলক - তাহলে এই অবতার পুরুষ-কে দর্শন করাও এক বিরাট সৌভাগ্যের কথা?

বাবা - সেটা ঠিক। সবার ভাগ্যে সেটা হয় না।

বাবা বলছেন, - "অবতার যখন আসেন সবাই জানতে পারলে তাঁর একটা চুল দাড়িও থাকবে না।" অবতার হলেই যে তাঁর চুল-দাড়ি থাকতে হবে, সেরকম কোনো শাস্ত্রীয় বিধান আছে কিনা জানি না। তবে যতদুর মনে হয় সে রকম কোনো বিধান নেই। কারণ শ্রী রামচন্দ্র, শ্রী কৃষ্ণ, বুদ্ধ দেব প্রভৃতি অবতারগণের চুল ছিল, কিংবা দাড়ি ছিল বলে জানি না। তবে বাবা চুল-দাড়ির (বিশেষতঃ দাড়ির) কথা বলছেন কেন? একি তাঁর অসাবধানতাবশতঃ উচ্চারিত 'কথার-কথা' মাত্র? না, তা হতে পারে না। কারণ বিভিন্ন সময়ে তাঁর পবিত্র সঙ্গ লাভ করে তাঁকে যা বুঝেছি, - তিনি ভাবাবেগে বা অহেতুক কোনো কথা বলেন না। সুতরাং নিশ্চিত ভাবে এ ধারণা করা যায়, - তিনি তাঁর নিজের চুল-দাড়ির অস্তিত্ব স্মরণে রেখে দয়াপরবশ কথাগুলি বলছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর অবতারত্বের ইঙ্গিত দিচ্ছেন। ইতি পূর্বেও বিভিন্ন কথার মাধ্যমে বহুবার তিনি এ ধরনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। আশ্চর্য্য, সেই 'পরম পুরুষ' আজ নরলীলায় অবতীর্ণ হয়ে কি সুন্দরভাবে নিজেকে সবার কাছে গোপন করে রেখেছেন! আবার ভক্ত শিষ্য অন্তরঙ্গদের কাছে কত রকম ভাবেই না নিজেকে প্রকাশ করছেন। তাই আমরা তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভ করে মহা সৌভাগ্য বান।

বাবা (নিতাই-কে) - মহাপ্রভূ, এবার তোমরা বল; আমি শুনি। অলক - তোমাকে পেলাম - এটা একদিকে যেমন আমাদের সৌভাগ্য, আবার অন্যদিকে তেমন দুর্ভাগ্য।

বাবা (বিস্মিত হয়ে) - কি রকম?

অলক - এত দেরীতে তোমাকে পেলাম - এটাই দুর্ভাগ্য।

বাবা — না না দুর্ভাগ্য হবে কেন। সংসারের সব কিছু দেখে শুনে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিয়ে তোমরা এসেছ। এরও প্রয়োজন আছে। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্য-কে যখন কামশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করতে বলা হলো, সে বিষয়ে তখন তাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। তাই তিনি সময় চেয়ে নিয়ে প্রথমে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং তারপর আলোচনায় বসেন। আর তোমরা সব ব্যাপারেই কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করে এখানে এসেছ। সহজে আর ঠকতে হবে না কোন কিছুতে তোমাদের।

নিতাই — তোমার সংস্পর্শে এসেও তোমার সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারলাম না।

বাবা — হ্যাঁ হ্যাঁ 'পাগলের ডায়েরী'-তে সবকিছু লেখা আছে। সময়ে সব জানতে পারবে।

অলক — পাগলের ডায়েরী না বলে ওটাকে 'সেয়ানার ডায়েরী' বলাই ভাল। কারণ পাগলের ডায়েরী হলে ওটা যত্রতত্র পড়ে থাকত, আর এতদিনে আমরা ওটা দেখেও ফেলতাম। (কথাটি শুনে বাবা একটু হাসলেন। পাঠকবর্গ — বাবা নিয়মিত ডায়েরী লেখেন। সেটাই 'পাগলের ডায়েরী')।

অলক — যোগী মহাপুরুষদের শক্তি ঠিক কতটা, তা কি তারা জানতে পারে?

বাবা — না। যাচাই করে দেখার সুযোগ কই? তবে বিরাট কিছু একটা ঘটে যাওয়ার পর আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই। কারণ ঠিক যেরকম আমি ভেবে থাকি, হুবহু সেইরকমই ঘটে থাকে।

অলক — মনুষ্য দেহধারী ভগবান ভুল করেন না?

বাবা — হ্যাঁ করেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা শুধরে নেন।

নিতাই — ধরো, তাঁর সামান্য একটু ভুলের জন্য আমাদের পূর্ব-জন্মের স্মৃতিটা সামান্য একটু জেগে উঠলো — এরকম হয় না?

বাবা (হাসতে হাসতে) — ও..... এই ব্যাপার? (নিতাই ও অলক দুজনেই হাসছে)।

দেখ, সময় সময় মনে হয়, আমার কিছু ছেলেকে এই মূহুর্ত্তে হাতে-কলমে সবকিছু দেখিয়ে পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেই। কিন্তু পরমূহুর্ত্তে যেন আমার জিভটা ভেতর থেকে টেনে ধরে। তখন আমি একদম স্থির হয়ে যাই। ভাবি, ঈশ্বরের বিধান তো ঠিক সে রকম নয়। যে বিধান তিনি নিজে তৈরী করেছেন, তা তিনি ভাঙ্গেন কেমন করে? তিনিও নির্দ্দিষ্ট ছক মেনেই চলেন। এটা হলে ওটা, এই রকম হওয়ার পর ঐ রকম — এই ধরনের-ই সব। তবে, তোমরা দেখছি পূর্ব জন্ম জানার ব্যাপারে উতলা হয়েছ।

অলক — এটা কি খারাপ?

বাবা — না না খারাপ হবে কেন? আগ্রহ থেকেই তো আসল বস্তু লাভ হয়।

রোজ রাতে ঘুমোনোর আগে বালিশে মাথা রেখে একমনে চিন্তা কর — আমি কে, কোথায় ছিলাম, কেনই বা এলাম। গুরু-র সাথে আমার সম্বন্ধ-ই বা কি — এইরকম চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একদিন সবকিছুই পরিস্কার হয়ে যাবে।

অলক — অনেকে জপ-ধ্যান করার সময় অনেক কিছু দেখে বলে শুনে থাকি আবার অনেকে কিছুই দেখে না — এরকম হয় কেন? যারা কিছুই দেখে না, তাদের আধার কি খারাপ?

বাবা — যে যা দেখছে দেখুক। ওসবে তোমাদের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। আধার অনুযায়ী যার যেমন প্রয়োজন, তেমনভাবেই তিনি তাকে চালাচ্ছেন। দিনের পর দিন কিছুই হচ্ছে না ভেবে যখন কেউ হতাশ হয়ে পড়ে, তখন তিনি প্রদীপের সল্‌তে-টা একটু উস্‌কে দেন। ফলে, একটু কিছু দেখে বা উপলব্ধি করে সে আবার নুতন উদ্দমে পথ চলতে শুরু করে। কটা বাজল এখন?

নিতাই — বারোটা অনেকক্ষণ আগে বেজে গেছে বাবা। এখন বারোটা বেজে পঁচিশ মিনিট।

বাবা — আমার বারোটা তো বহুকাল আগেই বেজেছে। (বাবা সহ নিতাই ও অলকের হাসি)। এবার আমি উঠি? তোমরাও যাও, ঘুমাও এখন। (নিতাই ও অলক প্রণাম করার পর বাবা উঠে পড়লেন)।

গুরুদক্ষিণা (রহস্য) পূর্ণ অবতার শ্রী শ্রী ঠাকুর।

শ্রী শ্রী ঠাকুরের সংসারে প্রত্যাবর্তন

৩/৯/৮৪ এখন সকাল দশটা বেশ কিছুক্ষণ থেকে বাবা চুপ করে বসে আছেন সামনে মেঝেতে অলক বসে আছে। বাবা জিজ্ঞাসা করছেন — নিতাই, নারায়ণ কোথায়?

অলক — একটু বাইরে গেছে বাবা। আচ্ছা বাবা, শুনেছি গুরুদেব-কে অনেককিছু জিনিষ দিতে হয়।

বাবা (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর) — হ্যাঁ, গুরু-কে অনেককিছু দিতে হয়

অলক — কি কি জিনিষ দিতে হয় বাবা?

বাবা — থালা, বাটি, গেলাশ, আসন, শয্যা, বস্ত্র, উত্তরীয়, পাদুকা, ছড়ি, ছাতা, সোনা, চাঁদি — এই সবই দিতে হয়। (বাবা নিস্পৃহভাবে কথাগুলি বললেন। যেন কিছু বলা প্রয়োজন তাই বলছেন)।

অলক — এ ব্যাপারে তুমি শিষ্যদের কখনো কিছু বলনা কেন? তারা সবাই তো এতসব জানে না।

বাবা — অধিকাংশ সাধারণ মানুষের যা অবস্থা, কোনোরকমে তারা সংসার চালায়। সংসারের চাপে তারা জর্জরিত। এই অবস্থায় এসব কি আমার বলা সাজে? তাই আমি এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলিনা। (কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করে থাকার পর) অতসব না দিলেও হয়। এক কুচি সোনা দিলেই হয়। ওটা দিতেই হয়। আমি আমার প্রথম দুই বাবা-রে দিছিলাম (চোখের ইঙ্গিতে দেওয়ালে টাঙ্গানো শ্রী শ্রী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ এবং শ্রী শ্রী রাম ঠাকুরের ফটো দেখিয়ে)। এই বাবা-রেই (শ্রী শ্রী ঠাকুরের তৃতীয় গুরুদেব মহাবতার শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ-এর ফটো দেখিয়ে) কিছু দিতে পারি নাই।

অলক — কিন্তু এ ব্যাপারে তুমি তো কাউকে কিছুই বলো না। সবাই তো বাঁধা পড়ে থাকছে। উন্নতির পথে একটা বিরাট বাধা হয়ে থাকছে না তাদের? (কথাগুলি শুনে বাবা যেন কিছুটা চিন্তিত এবং কোনো উত্তর দিচ্ছে না দেখে অলক আবার জিজ্ঞাসা করছে)। তুমি কিছু বলছ না কেন বাবা? তুমি কি সবাই কে আটকে রাখতে চাও?

বাবা (অত্যন্ত মৃদুস্বরে) — ঠিক তা নয়। যখন যার যেটা প্রয়োজন হবে, তাকে দিয়ে সেটা করিয়ে নেওয়া হবে। (কথাগুলি শুনে অলক যেন আশ্বস্ত হলো। (১) বাবার সাথে যাঁরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন, ইদানীং বাবা তাঁদের অনেককে রায়পুর মন্দির নির্মাণকল্পে অর্থ দিয়ে বা অন্যান্য ভাবে সাহায্য করতে বলেন। চিন্তাশীল ভক্ত-শিষ্যগণকে এখবার গভীরভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি — মন্দির-নির্মাণ উপলক্ষ্য করে এই সাহায্যের মাধ্যমে বাবা কি তাঁর ভক্ত-শিষ্যদের আত্মোন্নতির পথ বাধামুক্ত করিয়ে নিচ্ছেন?

পবিত্রতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান অতিশয় গুহ্য এবং গুরু-র নিকট থেকেই তা প্রাপ্ত হতে হয়। শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে 'গুরুদক্ষিণা' ব্যতিরেকে গুরু প্রদত্ত জ্ঞান ও সাধন

ফলপ্রসূ হয় না। আজ পর্যন্ত এর কোনো ব্যতিক্রম হতে দেখা যায় নি। বাবা বলেন, — 'যার থেকে কিছু পেতে হয় তাকেও কিছু দিতে হয়।' এ সম্বন্ধে 'তৈত্তিরীয় উপনিষৎ'-এর শিক্ষাবল্লী অধ্যায় থেকে কিছু অংশের ব্যাখ্যা দেওয়া হলো ঃ-

"আচার্য্যের জন্য অভীষ্ট ধন আহরণ করিবে — প্রাচীনকালের আচার্য্যগণ বিদ্যাদানের নিমিত্ত কোনও অর্থ গ্রহণ করিতেন না। তবে শিক্ষার্থীর শিক্ষা সমাপনান্তে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ আচার্য্যের প্রিয় ধন দান করিবার প্রথা ছিল। গুরুদক্ষিণা না দিলে অধীত বিদ্যা ফলবতী হইত না। এই কারণে বলা হইয়াছেঃ আচার্য্যকে তাঁহার প্রিয়ধন দান করিয়া গুরুগৃহ ত্যাগ করিবে।"

(অতুল চন্দ্র সেনের 'উপনিষদ' গ্রন্থ। পৃঃ ৩৩২)

শ্রী শ্রী গুরুতত্ত্ব বর্ণনাকালে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীকে বলছেন ঃ-

"আসনং শয়নং বস্ত্রং বাহনং ভূষণাদিকম।

সাধকেন প্রদাতব্যং গুরোঃ সন্তোষকারণাৎ।"

অর্থাৎ, শ্রী গুরুর সন্তুষ্টির জন্য তাঁকে আসন, শয্যা, বস্ত্র, বাহন, অলঙ্কারাদি প্রদান করা সাধকের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

(স্বামী রঘুবরানন্দ সঙ্কলিত 'গুরু তত্ত্ব ও গুরুগীতা' গ্রন্থের ২২ নং শ্লোক, পৃঃ ৪৬।

'দীক্ষা'-র প্রকৃত অর্থ হলো আত্ম নিবেদন বা আত্মোৎসর্গ। গুরুপ্রদত্ত সাধন নিরন্তর অভ্যাসের ফলে চিত্ত যখন শুদ্ধ (কামনা বাসনাহীন) হয়ে প্রবলভাবে গুরুমুখী হয়, তখনই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করা সম্ভব, নচেৎ নয়। শ্রীগুরুর সন্তুষ্টির জন্য 'গুরুদক্ষিণা' স্বরূপ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁকে কোনও বস্তু প্রদান — একদিকে যেমন শিষ্যের জাগতিক বস্তুর প্রতি ভোগ বাসনা ত্যাগের মাধ্যমে গুরুর প্রতি আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধা ও সেবার মনোভাব প্রকাশ করে, অপরদিকে তেমন শিষ্যের ভবিষ্যৎ আত্মনিবেদনের প্রাথমিক সূক্ষ্ম-ইঙ্গিত বহন করে। শিষ্যের নিকট থেকে যদিও শ্রী গুরু জাগতিক কোনো বস্তুলাভের প্রত্যাশা করেন না, তবুও এ ক্ষেত্রে তিনি তা সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করে থাকেন। কারণ শাস্ত্রের এই প্রচলিত বিধান রক্ষা করে চলার মাধ্যমে শিষ্যের প্রভূত উন্নতির সম্ভাবনা নিহিত থাকে।

বাবার ক্ষেত্রে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ (মহাবতার শ্রী শ্রী বাবাজী মহারাজ-কে) কোনো দ্রব্য প্রদানের প্রয়োজন ছিল না। কারণ দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে তিনি তাঁর গুরুর নির্দেশে পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করেছিলেন।

বাবা এখন স্থির হয়ে বসে আছেন। কখনো তিনি তাঁর গুরুদেবের ফটোর দিকে চেয়ে থাকছেন, কখনো চোখ বুঁজে কিছু যেন ভাবছেন। এই অবস্থায় নিতাই ও নারায়ণ ঘরে ঢুকে বসল। বাবা এবার নড়েচড়ে বসলেন।

বাবা — আমি কিন্তু সংসারে ফিরতে চাইনি। বাবা (শ্রী শ্রী ঠাকুরের গুরুদেব) আমাকে উত্তরকাশীতে নিয়ে গিয়ে সংসারে ফিরে যেতে বললেন। বাবার মুখ থেকে কথাটা শুনে আমি হাউ হাউ করে কাঁদছি। তখন তিনি আমার হাতে তালপাতার একটা পাখা দিলেন। পাখাটা হাতে নিয়ে বাবার ওপর বিরক্ত হয়ে ভাবি একেই আমার মনের অবস্থা এইরকম। তার ওপর বাবা আবার কি এমন একটা জিনিষ দিলেন? তিনি কি আমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছেন না? পরমূহুর্ত্তে আমার বিবেক যেন ধমকের সুরে বলে উঠে — "তুই অতসব ভালমন্দ বিচার করার কে? গুরুদেব নিজে হাতে করে দিয়েছেন, ওটা রেখে দে।" তারপর একসময় আনমনে পাখাটা নাড়াতেই সমগ্র উত্তরকাশী-টা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। সেখানকার রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর, মানুষজন ইত্যাদি সবকিছুই যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু মানুষগুলোর মুখের জায়গায় এক-একটা জানোয়ারের মুখ দেখছি! মানুষগুলোর হাত পা ইত্যাদি সবকিছুই ঠিক-ঠাক আছে। কেবল মুখের বদলে এক একটা জানোয়ারের মুখ। রিক্সা চালাচ্ছে মানুষ, কিন্তু তার মুখটা একটা শেয়ালের মতো। আবার রিক্সায় বসে আছে মানুষ, মুখটা তার হায়নার মতো। বাকীগুলো দেখছি মানুষ, কিন্তু কোনোটার মুখ বাঘের মতো, আবার কোনোটার ভাল্লুকের মতো। এসব দেখেশুনে আমার ধারণা হলো — সংসারে মানুষ আছে, কিন্তু এক একজনের প্রবৃত্তি এক একটা জানোয়ারের মতো। এদের সঠিক পথ দেখানোর জন্যই বাবা আমাকে সংসারে ফিরে যেতে বলছেন। তখনো আমি কাঁদছি দেখে বাবা বললেন, — **"কি রে, ষোল-কলা পূর্ণ করে তোকে নিয়ে এলাম, আর এখনও তুই এইরকম করছিস?"** (বাবার দু-চোখ থেকে অবিরল অশ্রুধারা নেমে আসছে। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে সবাই এ দৃশ্য দেখছে)। কথাগুলো শুনে আমি অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাতেই তিনি উত্তর দেবার ভঙ্গীতে বলেন, — **"হ্যাঁ। তোর মার গলায় একটা পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষের মালা**

ছিল। আর তোর বাবার গলায় এগার মুখী রুদ্রাক্ষের আরেকটা মালা ছিল না? এগার আর পাঁচ যোগ করলে 'ষোল' হয় না? আর আপত্তি করিস না। সংসারে ফিরে যেতে। কাশীতে তোর স্ত্রী প্রথমে তোকে নিতে আসবে। তোর জন্য সে অনেক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করেছে। তুই তার সাথে ফিরে যেতে আপত্তি করিস না। তুই কিছু চিন্তা করিস না লোকজন বা সংসার সম্বন্ধে। জানিস তো, রাজার তিন ছেলের একছেলে রাজা হয়। আর দু-জন 'পেনসন' ভোগ করে। তাই সংসার চালানোর ব্যবস্থা আমিই করে দিলাম। ভিক্ষাবৃত্তি-ও অবলম্বন করতে হবে না তোকে। যার যা কিছু দেওয়ার তোর কাছে এসেই দিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতেও হবে না তোকে।" দেখ (সবাইকে উদ্দেশ্য করে) — সবাই এসে প্রণামী দিচ্ছে, তাই বছরের পর বছর ধরে এতবড় 'লঙ্গরখানা' চলছে। বাড়ীর মানুষজন ছাড়া প্রতিদিন কত কত মানুষ ও বাড়ীতে আসছে ও প্রসাদ পাচ্ছে। তাঁর কৃপা না থাকলে বছরের পর বছর ধরে এতবড় লঙ্গরখানা চালায়, কার সাধ্য? এটাই একটা বিরাট অলৌকিক।

সংসারে ফিরে যেতে তবুও আমার মন সায় দিচ্ছে না। চোখের জলে ভাসিয়ে আবারও বাবাকে বললাম — আমি তো 'গুরুসেবা' করতে পারলাম না। আর 'গুরুদক্ষিণা'-ও দিতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে বাবাও বলে ওঠেন, — "সে কিরে! এই ব্রহ্মাণ্ডে মানুষ থেকে শুরু করে সমস্ত রকমের জীব এবং যেখানে যা কিছু দেখছিস, তার সেবা আমারই সেবা। আর গুরুদক্ষিণা? সমগ্র বিশ্বের জন্যই সেটা তোকে দিতে হবে। তুই সংসারে ফিরে গিয়ে বেছে বেছে 'আটটি সন্তান' আমাকে উপহার দে। সমগ্র বিশ্বে আমি দেখাব 'ধর্ম্ম' কাকে বলে — সেটাই হবে তোর গুরুদক্ষিণা।"

জয়গুরু শ্রী গুরু

গুরু ঃ কৃপাহি কেবলম